গত ৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের থেকে আসন্ন অর্থবছরে শিক্ষার তিন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ১১ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মোট ৮১ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১ হাজার ৭৬১ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের জন্য এ অর্থবছরে ৯ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে।

কভিডকালে দেশের শিক্ষার্থীরা দুই বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরে ছিল। কাজেই অবধারিতভাবে তাদের শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ বিঘ্নিত হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কানেক্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে এতে তারা কিছুটা উপকৃত হলেও সব শিক্ষার্থী অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ছিল অপ্রতুল। তা ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে হলে টেকনোলজির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কভিড-১৯ অতিমারির কারণে বিগত দুই বছর দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষাব্যবস্থায় যে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে তা মোকাবেলার জন্য এবং লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় কার্যকরভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। সেই ধরনের কিছু কিন্তু আমরা বাজেটে দেখতে পাই না। করোনাকালের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ব্লেন্ডেড লার্নিং সিস্টেমের কথা বলা হচ্ছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। এ দুটি ব্যবস্থা এখানে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বাজেটে অপটিক্যাল ফাইবারের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে ও ল্যাপটপ আমদানিতে ভ্যাট বসিয়ে ইন্টারনেট ও ডিভাইস কেনার খরচ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা এসেছে, যা পুরো বিষয়টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

পাসের হার দিয়ে শিক্ষায় আমাদের অগ্রগতি হলেও মানের দিক থেকে আরো অনেক এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই খাতগত বরাদ্দের দিক থেকে কর্মসংস্থান ও শিক্ষায় উচ্চ বরাদ্দ প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে, যেটি কাজের বয়স হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল এবং ২০৫১ সালে শেষ হবে। সাধারণত একটি জাতির জীবনে এই সুযোগ বহু বছর পর পর আসে। তবে এই সুযোগ ২০৩১ সালের পর থেকে সংকুচিত হতে শুরু করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাড়া প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। সুতরাং জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ গ্রহণ করা হয় এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়নি সেগুলো এমপিওর জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। যেগুলো এমপিও হয়েছে সেগুলো জাতীয়করণের জন্য আন্দোলন করছে। তারা ভাবছে রাষ্ট্র তাদের ঠকাচ্ছে। আবার এটিও ঠিক যে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষা প্রদান করা। তবে কতজন জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন, কতজনের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রয়োজন—তার একটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের থাকা উচিত। দেখা যাচ্ছে, একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিল্ডিংসহ সব ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, কিন্তু শিক্ষার্থী মাত্র ৫০ জন কিংবা ১০০ জন। একইভাবে অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষার্থী ২০-৩০ জন, এমনকি দুই-তিনজন শিক্ষার্থী নিয়েও একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে। এই বিষয়গুলো একটি সঠিক ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে দেশে কোন পর্যায়ের কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, কতগুলো জনসংখ্যা ও এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে প্রকৃতার্থে প্রয়োজন—তার হিসাব কিন্তু মন্ত্রণালয়ের থাকা উচিত। বিষয়টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের

মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। কাজেই এসব কর্মকর্তাকে ক্ষমতায়িত করতে হবে এবং প্রকৃতার্থে যাঁরা শিক্ষানুরাগী, শুধু একটি চাকরির খাতিরে চাকরি করছেন—এমন কর্মকর্তাদের এ বিভাগে যাতে না দেওয়া হয় সেই বিষয়টিও খেয়াল রাখা দরকার।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেন যেকোনো ধরনের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিপত্তি বা ঝুঁকি মোকাবেলা করা যায় সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে। জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা সমন্বয় থাকতে হবে। এ জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সাবধানতা অবলম্বনের বিষয়ে অবশ্যই গুরুত্বারোপ করতে হবে। ইউনেসকো শিক্ষার জন্য অনুরূপ বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করে। কভিড-১৯ আমাদের শিক্ষাকে অনেকটাই ধ্বংস করেছে, যদিও আমরা এ বছর ৭.৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি আশা করছি এবং তা জনগণের মাধ্যমে করতে হবে, তাই সে হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে আমাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে এবং বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত ৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া উচিত। অথচ জিডিপির মাত্র ১.৮৩ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষা খাতে। গত অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১১.৬৯ শতাংশ, এবার তা হয়েছে ১২.০১ শতাংশ। বিগত কয়েক দশক ধরেই ১২ শতাংশের কাছাকাছিই ছিল এই বরাদ্দ, তাই এই বছরের বাজেটেও শিক্ষা খাত রয়েছে গতানুগতিক ধারায়।

শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে, কিন্তু খাতগুলো উল্লেখ থাকতে হবে, কোন খাতে কত বরাদ্দ এবং কিভাবে সেটি ব্যয় করা হবে। তা না হলে শুধু বরাদ্দ বাড়ালে তা অপচয় হয়। যেমন—নায়েমে একটি বরাদ্দ দেওয়া আছে। হঠাৎ যদি তারা আরো বরাদ্দ পেয়ে যায় এবং কোনো ধরনের নির্দেশনা না থাকে যে এই বিষয়ে এত টাকা ব্যয় করতে হবে এবং এর ফল বা আউটকাম হবে, এটি তখন তার যৌক্তিকতা থাকে এবং অর্থটাও মোটামুটি সঠিকভাবে ব্যয় হয়।

লেখক : কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব)

masumbillah65@gmail.com